অনিকেতন

আবদুর রউফ চৌধুরী

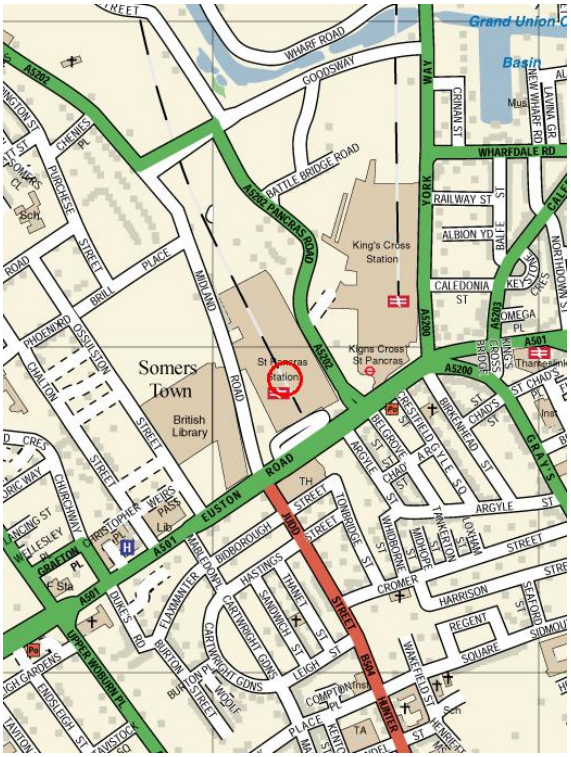

Grand Union
Basin
WHARF ROAD
GOODSWAY
WHARFDALE RD
BATTLE BRIDGE ROAD
PANCRAS ROAD
YORK WAY
RAILWAY ST
ALBION YD
King's Cross Station
CALEDONIA ST
OMEGA PL
Kigns Cross St Pancras
St Pancras Station
Somers Town
British Library
MIDLAND ROAD
EUSTON ROAD
A501
A5200
A5202
PHOENIX RD
OSSULSTON STREET
CHALTON ST
BRILL PLACE
PURCHESE STREET
CHURCHWAY
CHRISTOPHER PL
WEIRS PASS
GRAFTON PL
DUKE'S RD
UPPER WOBURN PL
ENDSLEIGH ST
BIDBOROUGH
HASTINGS
MARLEDON PL
FLAXMAN TER
CARTWRIGHT GDNS
SANDWICH
THANET ST
JUDD STREET
TONBRIDGE ST
BELGROVE ST
ARGYLE ST
ARGYLE SQ
CRESTFIELD ST
BIRKENHEAD ST
ST CHAD'S ST
WHIDBORNE ST
MIDHOPE ST
TANKERTON ST
LOXHAM ST
ARGYLE STREET
HARRISON ST
CROMER
REGENT SQUARE
SEAFORD ST
WAKEFIELD ST
HUNTER ST
LEIGH ST
COMPTON PL
BURTON PL
BURTON STREET
WOBURN PL
HENRIETTA MS
GRAY'S

মানচিত্র

উৎসর্গ

শিরীণ চৌধুরীকে

যাকে দিয়েছি সংসারটি তাকে দিলাম এ বইটি ।

প্রথম অধ্যায়

বন্ধুর বাসায় ভুঁড়িভোজনের পর ফিরছিলেন বদরুদ্দিন; ইয়র্কওয়ে[১] রাস্তার মোড় ঘুরে প্যান্টনভিল রোডের[২] বইয়ের দোকানের সামনে সিগারেট কিনতে গিয়ে চোখে পড়ে, হাঁটুতে ভর দিয়ে অনেক মানুষের পায়ের চাপে ভেজা সিঁড়ি ভেঙে পাতালস্টেশন[৩] থেকে উপরে উঠে-আসা তাজিদউল্লাকে; সফেদ গোল কটন টুপিতে মাথা ঢাকা, কাঁচাপাকা কেশ– বেশ মানিয়েছে; থুতনীতে শুভ্র দাড়িগুচ্ছ– পানের পিক পড়ে কিছুটা ফিকে হয়েছে মাত্র। বদরুদ্দিন একটু দূর থেকে তাকিয়ে আছেন। এসময়ে পাতালস্টেশনে লোকের ভিড় থাকে, যেন যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব, কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নেই, তবুও অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা নিয়ে তাজিদউল্লা ভিড় ঠেলে, লাইন ধরে সামনে এগুতে লাগল। একটি লাইনের মুখে তাজিদউল্লা পাতালস্টেশন থেকে বেরিয়ে এলে বদরুদ্দিন প্রশ্ন করলেন, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'ইস্ট-লন্ডন মসজিদে[৪] জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম।' কথাটি শেষ হওয়ার আগেই বিলাতি ঠাণ্ডা-বাতাসের একটি চড় তাজিদউল্লার গালে ধাক্কা খেল, সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, 'ঠাণ্ডা-বাতাস ঠেলে এতদূর যেতে হত না যদি আমরা সকলে মিলে সাম্পান-ক্রুস[৫] এলাকায় বা তার আশেপাশে একটি মসজিদ স্থাপন করতে পারতাম।'

সামান্য কিছুর ওপর ভর করে দুর্বল লতাও তেলতেলিয়ে উঠতে চায় উপরে, তেমনি তাজিদউল্লার কথায় বদরুদ্দিনের চিন্তাধারায় চেতনালাভ করল, দুনিয়া ছেড়ে একেবারে চলে গেল বেহেশতে; অন্তর উচ্চারণ করল, দ্বীনদুনিয়ার মালিক হে তুমি দীনকে করো দয়া। একটুকরো ক্রূরহাসি ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দিয়ে নিমিষের মধ্যে মিলিয়ে গেল; মনোসরোবরে একটি ছোট্ট ঢিলের শব্দ যেন, তারপর সব স্তব্ধ। বদরুদ্দিন ঘাড় নুইয়ে, মাটির দিকে তাকিয়ে, অন্তরে সবচেয়ে বেশি যে-বিশ্বাস জন্মের পর থেকে সঞ্চয় করে আসছেন সেই বিশ্বাসকে সন্ধান করতেই হত প্রকাশ করলেন, 'সত্যিই তো, দুজাহানে যার ফায়দা– ফজিলত।'

পাতালস্টেশন থেকে বেরিয়ে আসা একজন লোক মাথানোয়ানো বদরুদ্দিনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে, হেসে 'ক্ষমা করবেন' বলে চলে গেল। নিঃশব্দে হেসে ফেলল তাজিদউল্লা, দাড়ির আড়ালে হাসিটা লুকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় বলল, 'চলুন আমরা দোকানের আগচালের নীচে দাঁড়িয়ে, সিগারেট ধরিয়ে আলাপ করি। সেখানে মানুষের ভিড় ও ঠাণ্ডা-বাতাসের দাপট কিছুটা কম লাগবে। অক্টোবর মাসে এমন ঠাণ্ডা কী কখনও দেখেছেন?'

'না, দেখিনি। চলুন তাহলে।'

'ওয়াক থু' শব্দে রাস্তায় থুতু ফেলে তাজিদউল্লা এগিয়ে চলল। তার টুপির দিকে নজর পড়তেই বদরুদ্দিন বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন একটি কথা বলি।' তাজিদউল্লা হালকাভাবে মাথা নাড়ল। দুল-খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন কী বুঝে নিয়ে যোগ করলেন বদরুদ্দিন, 'অবশ্য আপনিও জানেন যে, দেহের অর্ধেক তাপ বেরিয়ে যায় মাথা দিয়ে। তাই উলের টুপি পরা উত্তম, মাথাকে গরম রাখে। দেখছেন না আমি রাশিয়ান টুপি পরে আছি।'

হাত দিয়ে মুখ ও দাড়ি মুছে নিয়ে খুব দ্রুত হাতটা ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে তাজিদউল্লা বলল, 'তাদের টুপি যাতে বেশি করে ইংল্যান্ডে বিক্রি হয় সেজন্যেই সাইবেরিয়ার সব শীত পাঠিয়ে দিয়েছে রাশিয়া।'

বদরুদ্দিন একটু বিব্রতভাবে হেসে, তাজিদউল্লার দিকে একটু তাকিয়ে, বললেন, 'যাই বলেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পাতলা কাপড়ের টুপি, কিস্তি বা গোল যেকোনও আকারের বা প্রকারের হোক না কেন, শীত নিবারণে সাহায্য করে না।'

---

[1] Yorkway, London N1.
[2] Pentonville Road, London N1.
[3] King's Cross Thames Link, Pentonville Road, London N1.
[4] East London Mosque, Whitechapel Road, London E1.
[5] St. Pancras, London NW1.

তর্কে হেরে যাওয়া তাজিদউল্লার ধাতে নেই, তাই বলল, 'আপনার কথা আংশিক সত্য হলেও স্বীকার করতে হয় যে, সুন্নত পালনে সওয়াব আছে।'

বদরুদ্দিন সঠিক উত্তর খুঁজে না পেয়ে মুখের সামনে যা এল তা-ই বলে দিলেন, 'গরম দেশের সুন্নত শীতের দেশে পালন করা হলে লোকে হাসবেই!'

তাজিদউল্লা কিন্তু যুৎসই উত্তর পেয়ে গেল, 'নাসারার হাসি তো নগণ্য। আল্লার খুশিই আমাদের কাম্য।'

বদরুদ্দিন এবারের মত রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হলেন, বললেন, 'দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়েও বাতাস থেকে বাঁচা যাচ্ছে না। আমি বলি কী, শীতে কটকট করে কথা কাটাকাটি না-করে চলুন আমার বাড়িতে। গরম-করে-রাখা ঘরে বসে, গরম গরম চা পান করতে করতে ভেবে দেখা যাবে নরমগরম কথা দিয়ে কীভাবে ইসলামের নামে এ-অঞ্চলের মানুষকে সরগরম করা যায়।'

পাশাপাশি দুজন হেঁটে চললেন, ওভারকোটের পকেটে হাত রেখে। একটু দূর অগ্রসর হতেই বদরুদ্দিন পকেট থেকে হাত বের করে অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন, 'এই গির্জায়[৬] আজকাল মার্জারও যায় না। এটা মসজিদ করতে পারলে বেশ সেন্টারে পড়বে। এখানে মসজিদ হলে ওয়াজ-নসিহাৎ শুনে আমাদের সন্তানরা খ্রিস্টান কৃষ্টিভক্তি থেকে বিরত থাকবে, এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তারা বুঝতে পারবে যে, অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলাম অনেক বেশি প্রগতিশীল ধর্ম।'

বিজ্ঞের হাসি হেসে তাজিদউল্লা বলল, 'কে জানে! আপনি এমন কথা কোথায় পেয়েছেন? আসলে কথাটা ঠিক নয়। নদীর স্রোতে গতি আছে বলেই তো পানি অহরহ বদলায়; বলতে পারেন খ্রিস্টান-ধর্মের মত। কিন্তু পুকুরের পানি পরিবর্তনহীন, তার স্রোতে গতি নেই; বলতে পারেন ইসলামের মত।'

'এতসব জানলেন কোত্থেকে?'

'কথাটি আসলে আমার নয়, আজ মসজিদে ইমামসাব ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাই আপনাকে সহজে বুঝিয়ে বলতে পারলাম।' তাজিদউল্লার হাসির লহরি বেড়ে গেল। বদরুদ্দিন বুঝলেন এবারও সে তাকে হারিয়ে দিয়েছে; এজন্যেই কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'সেদিন এক ব্যারিস্টার বলেছিলেন যে, একটি জারুল গাছের পাতিডাল যদি সামান্য ছেঁটে দিলে মূলবৃক্ষের কোনও ক্ষতি হয় না, বরং কাণ্ডের পুষ্টি সাধিত হয়। তেমনি ইসলামের মূলনীতিগুলো অক্ষুণ্ন রেখে কালোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ রদবদল করলে কোনও অনিষ্টা হওয়ার কথা নয়, বরং শক্তিশালীই হওয়ার কথা।'

তাজিদউল্লার কপালে কয়েকটি চিন্তারেখা দেখা দিল। বদরুদ্দিন সেগুলোকে দাড়ি আর কমা বসিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, 'ধরুন, জাকাতেরই কথা। শতকরা আড়াই-ভাগের জায়গায় পাঁচ-ভাগ করলে আল্লাহর নির্দেশের বরখেলাপ তো কিছুই করা হয় না, বরং আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় পরিমাণ বাড়ানো হবে মাত্র।'

'একটু বুঝিয়ে বলুন।'

'মনে করুন, বছর কয়েক আগে ঈদের ফিতরা দিতেন আট-আনা আর এখন দিচ্ছেন আঠারো টাকা– এতে যদি দোষ না হয় তবে জাকাতের পরিমাণ বাড়ানোতে দোষ হবে কেন? উভয়ের তো একই উদ্দেশ্য– দুঃখীজনকে সাহায্য করা।'

তাজিদউল্লার মুখে চকিত পরিবর্তন আসে, দৃষ্টিতে সন্দেহযুক্ত বিস্ময়, অপরিচিত কথার অভিব্যক্ত যেন, কপালে ভ্রূকুটি চিন্তা, একটু হেসে বলল, 'আপনি যে কী বলেন বদরুদ্দিনসাব....।' তাজিদউল্লাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বদরুদ্দিন আধপোড়া সিগারেটে সুখটান শেষ না করেই রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে একটু দম নিয়ে যোগ করলেন,

[6] Situated on Pentonville Road, London N1.

‘ব্যারিস্টার আরও বলেছিলেন যে, কোরআনের যেস্থানে যাতায়াতের প্রশ্নে উটের উল্লেখ আছে সেখানে আজকাল যোগ করা উচিত এ্যারোপ্লেন, অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় কোরআনের ব্যাখ্যাভাষ্যে দেশকাল ভেদে নতুনত্ব আনয়ন করা প্রয়োজন; ইসলামকে সর্বদেশের সর্বকালের সার্বজনীন ধর্মে পরিণত করার জন্য। সত্যি তাজিদউল্লাসাব, ব্যারিস্টারের কথা শুনতে খুব ভালোই লাগল।’

‘আপনি কী যে বলেন বদরুদ্দিনসাব, ঘাটু নাচ ভালো লাগে,’ তাদের পাশ দিয়ে নীরবে একটি মহিলা এগিয়ে গেল আর তার পেছন থেকে নিরীহ মুখে একটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল, কুকুরটি ঘেউ-ঘেউ থামার পর তাজিদউল্লা বলল, ‘তাই বলে কী এতে আকৃষ্ট হতে হবে?’ উচ্চস্বরে হেসে উঠল তাজিদউল্লা। তার অট্টহাসির শব্দে শঙ্কিত হয়ে উড়ে গেল একজোড়া পায়রা– খাবার ফেলে, প্রাণের ভয়ে।

ট্রি-টপ স্ট্রিটের[৭] ছাপ্পান্ন নম্বর[৮] বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন বদরুদ্দিন ও তার বন্ধু। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই একটি বেণী ঝুলিয়ে, ধনেখালিজিড়ের রঙের জামা-পায়জামা পরা লাভলী সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল, আর শিল্পী তার পিছন পিছন নির্ভেজাল হাসি ছড়িয়ে এগুতে লাগল। লাভলী আর শিল্পী দুই বোন। দুজনের অবস্থার ও চরিত্রের মিল থাকলেও, আসলে সূক্ষ্ম বেমিল আছে অনেক কিছুতেই। লাভলী বাড়ির বড়ো মেয়ে, বদরুদ্দিনের খুব প্রিয়, তাই তার আবদার অপূর্ণ থাকতে পারে না। মা-বাবার আদেশ ও নিয়ম মেনে যা খুশি চাইতে পারে, যা খুশি করতে পারে, কোনও বাধা নেই, সমস্ত কিছুই যেন তার ইচ্ছেমত করতে পারে; কিন্তু শিল্পী আলাদা, সকলের কথামতই তাকে চলতে হয়, সে মা-বাবার নেকনজরে থাকার চেষ্টা করে, কিছু না পেলেও চায় না, চাইবার ইচ্ছেও নেই তার। মেয়েরা উপরে চলে যেতে-না-যেতেই বদরুদ্দিন ও তার বন্ধু বসারঘরে প্রবেশ করলেন। দরজার পাশের একটি চেয়ার দেখিয়ে বদরুদ্দিন বললেন, ‘বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।’

বদরুদ্দিন বসারঘর থেকে বেরিয়ে, দরজা পেরিয়ে পর্দার অপর পাশে, নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরেও এলেন। পর্দা ফাঁক করে ফিক করে হেসে বললেন, ‘কী আশ্চর্য! আমার চিন্তাধারার সঙ্গে আপনার চিন্তার কেমন মিল। আমার মন কিছুদিন ধরে ব্যাকুল হয়ে আছে একটি মসজিদ স্থাপনের চিন্তায়। কোনদিন আবার অকস্মাৎ বাকসন্দী হয়ে যাব তখন আর বুদ্ধি খাটিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সন্ধি করার সময় পাব না।’ কথাটি বলেই মনে পড়ল, ছোটমেয়ের অবাধ্যতা আর বড়ছেলের উশৃঙ্খলতার কথা, তাই যোগ করলেন, ‘ছেলেমেয়ে আল্লাহ-রাসুল মানে না। মা-বাবাকে সম্মান করতে শিখল না।’ একথার সঙ্গে আরেকটি চিন্তা মনের পর্দায় প্রতিফলিত হতেই বদরুদ্দিনের মুখমণ্ডলের পেশীগুলো শক্ত হয়ে জেগে উঠল, ক্ষণিকের জন্য, আজকাল একথা প্রায়ই উঁকি দেয় তার মনের দুয়ারে; সাপুড়িয়া যেমন ঝাঁপিতে রাখা সাপের উদ্যতফণা ছিদ্রপথে দৃষ্টিগোচর হলেই ঢাকনা দিয়ে ঝেঁপে রাখে, প্রদর্শনীর সময় না হওয়া পর্যন্ত, ঠিক তেমনি বদরুদ্দিনের মনের অবস্থাও, সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় আছেন, সুযোগ কখন কোন অপ্রত্যাশিত পথে আসবে কে জানে, তাই আশামৃগের অপেক্ষায় থাকতে হয় নতুন প্রস্তুতি নিয়ে; অবাঞ্ছিত এই ভাবনার ওপর ঢাকনা দিয়ে, কপালের চিন্তারেখায় কোনওকিছু প্রকাশ না করে প্রশ্ন করলেন, ‘আমাদের আশা সফল করা কী সম্ভব?’

আশ্বাস দিল তাজিদউল্লা, ‘আমরা একতাবদ্ধ হলেই সব সম্ভব।’ একথায় বদরুদ্দিনের হাসি পেল, কালো ওষ্ঠাধরের আবেষ্টনীতে শাদা দাঁতগুলো অতীবসুন্দর দেখাচ্ছে, কিন্তু এ-হাসিতে তাজিদউল্লা খুশি হতে পারল না। এ কোন ধরনের বিদ্রূপের হাসি, ভেবে না পেয়ে সে একটু অপ্রস্তুতভাবেই প্রশ্ন করল, ‘হাসছেন যে খুব?’

‘হাসছি, আপনার একতার প্রস্তাবে। ব্যাঙ কী একপাল্লায় ওজন হয়! একতার অভাবেই তো বাঙালির আজ এমন অধঃপতন, অন্যজাতির ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষয়।’ বদরুদ্দিনের মনের পর্দায় একাত্তরের কথা ভেসে উঠতেই যোগ

[7] Northdown Street, London N1.
[8] Imaginery House Number.

করলেন, 'একবার শুধু একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এক হয়ে কী অসম্ভবকেই না সম্ভব করেছিলাম। স্বাধীনতা-মরকত-মণিকে দস্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম নিজের হাতের মুঠোয়।' কথাটি বলেই মনে মনে জিভ কাটলেন বদরুদ্দিন। তাজিদউল্লা একজন নামকরা রাজাকার, স্বাধীনতার শত্রু। মুখের কথা বা ধনুকের তীর যদি একবার ছুঁড়ে দেওয়া হয় তাহলে তাকে কী আর ফিরিয়ে আনা যায়, তবুও যথাসম্ভব চেষ্টা করা প্রয়োজন, ভাবলেন বদরুদ্দিন।

দুকাপ চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল বরকত, বদরুদ্দিনের ছোট ছেলে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ছেলের হাত থেকে একটি কাপ তুলে নিয়ে সযত্নে রাখলেন তাজিদউল্লার সামনে। তাজিদউল্লার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডান-হাত দিয়ে তার বাঁ-কাঁধে একটু চাপ দিলেন, তারপর আদর করে বললেন, 'শরীর এতক্ষণে গরম হয়ে যাওয়ার কথা, ওভারকোটটি খুলে দিন, রেখে দেই।'

বদরুদ্দিন কোট খুলতে সাহায্য করলেন, ভাঁজ করে রেখে দিলেন হ্যাঙারে, ফেরার পথে পানের থালাটিও সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, পান-সিগারেট পরিবেশন করলেন পরিবেশ সহজ করার উদ্দেশ্যে; তবে তিনি জানেন, গলায় বিঁধে যাওয়া মাছের কাঁটা বের করে আনলেও অস্বস্তি থেকে যায়, সহজে যায় না।

লাভলী নিজের ঘরে না গিয়ে সোজা শিল্পীর ঘরে আসার জন্য লম্বা করিডোর মৃদুপায়ে ভাঙতে লাগল। এতক্ষণ তার বাবা নিচতলার বসারঘরে বন্ধুর সঙ্গে ব্যস্ত ছিলেন, তাই সে নিজেকে রান্নাঘরে আসামীর মত বন্দী করে রেখেছিল, উপরে উঠে আসা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভবই ছিল। আড্ডা শেষ হতে-না-হতেই শিল্পী তার ঘরে একটি হিন্দি ধুমধরাক্কা মিউজিক বাজাতে শুরু করেছে। করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লাভলী শুনছিল মিউজিকটা। মৃদুমন্দ পায়ে শিল্পীর ঘরের সামনে আসতেই রুবেল হঠাৎ উচ্ছল ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল। বদরুদ্দিন তার বাসাতে রুবেলকে তুলে এনেছিলেন পাঁচ মাস আগে, কিন্তু সে এদেশে এসেছে দুবছর হল, ভ্রমণ ভিসায়; ছেলেটি বদরুদ্দিনের নিকটাত্মীয়, তিনি রুবেলের বাবাকে কথা দিয়েছিলেন ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটি তিনিই করবেন। লাভলীর দিকে একবারের জন্যও রুবেল না থাকিয়ে নিজের ঘরের ভেতর পা দিয়ে ঠাস করে দরজাটি বন্ধ করে দিল। লাভলী একমুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে শিল্পীর ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল তার বোনটি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, খাটের পায়ের দিকে মাথা, অদ্ভুত শোয়ার ভঙ্গি, শুধু তার পায়ের দিকে একটি টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে, তাই হয়ত লাভলীকে সে দেখতে পেল না। শিল্পীর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল লাভলী, মনের মধ্যে আকাশপাতাল আলো-অন্ধকার মিশানো একটি অনুভূতি জেগে ওঠেই আবার আস্তেধীরে ঝাপসা হয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। লাভলী বলল, 'একসঙ্গে মউজিক শোনা আর বই পড়া কি সম্ভব?'

'আমার বেলায় সবই সম্ভব।'

লাভলী হতভম্বের মত একবার এই রূঢ়াচরণের কারণ খুঁজতে গিয়ে দৃঢ়দৃষ্টি স্থাপন করল শিল্পীর ঘনকালো চুলের দিকে, অন্ধকারই হয়ত সত্য প্রকাশ করে; তারপর দরজার সামন থেকে এগিয়ে এসে শিল্পীর পাশে বিছানায় বসতে বসতে সে গভীর গলায় বলল, 'অবেলা এভাবে তুই মিউজিক শুনলে আব্বা রাগ করবেন।'

ভ্রূকুঞ্চনে বিদ্যুচ্চমকের মত বিরক্তির আভাস লেপটে ও চোখে মহাবিস্ময়ের ভাবটি ফুটিয়ে শিল্পী বলল, 'আমার বেলাতেই সব!'

লাভলী বুঝে, শিল্পীর জীবনে যেন একটি বিলাতি নেশাভরা আতসবাজির চঞ্চলোৎসব নিরন্তরভাবে চলে বেড়াচ্ছে। লাভলীর দুচোখে ঘৃণার কুঞ্চনরেখা একমুহূর্তের জন্য ফুটে উঠল, আবার মিলিয়েও গেল, তারপর বলল, 'জানিসই তো আব্বা তোকে কম আদর করেন না, কিন্তু তিনি ভয়ানক অবুঝ।'

'আমার বেলাতেই সব শাসন।' শিল্পী কথাটি বলতে বলতে টেপরেকর্ডারটি বন্ধ করে দিল, তারপর যোগ করল, 'তোমার বেলা আব্বা কিচ্ছু বলেন না।'

শিল্পীর আকস্মিক বিদ্রোহ লাভলী প্রত্যাশা করেনি, যদিও নালিশটা নতুন নয়; মুখে রহস্যচিন্তারেখা সৃষ্টি করে, সঙ্গে একটি নিশ্বাস জোরে ত্যাগ করে বলল, 'আমি আবার কী করলাম?'

'কেন সারা দিন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছ, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ, রাস্তাঘাটে সময়-অসময় তোমাকে দেখা যাচ্ছে– এসব কী আব্বা দেখন না। দেখেন ঠিকই, কিন্তু কিচ্ছু বলেন না। আমার বেলাতেই যত আইন!'

লাভলী নিশ্চুপ। চিন্তা না করে কথা বলার চেয়ে নীরবে আনমনা হয়ে বসে থাকাই ঢের উত্তম। লাভলীর মুখ দেখে রাগ বোঝা যায় না, শুধু চোখের পলকগুলোই অনিয়মভাবে পড়তে লাগল। লাভলীর স্বভাবে যে বিলাতিপ্রকৃতিগত উচ্ছ্বলতা নেই তা নয়, তবে তার চেহারায় অবশ্যই আছে টকটকে ফর্সা রঙটি, দুটো টানাটানা চোখ, উন্নত নাক, দেহ গড়নে সৌন্দর্যের মহিমা আত্মগোপন করে থাকে সবসময়, তাই হয়ত ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলতে তার কোনও জড়তা নেই, তবুও তার মনের মধ্যে বিরাজ যে করছে না জীবনের অনেক অভিযোগ, অবিচার, সন্দেহ তা নয়, কিন্তু অন্তরে যত কিছুই জমা থাকুক না কেন, সে মিথ্যা কথা বলতে পারে না, সে অতীত বা ভবিষ্যৎ যেদিকেই প্রবাহিত হোক না কেন, বর্তমানকেই কেন্দ্র করে তার চিন্তাধারা পাক খায় সবচেয়ে বেশি, তাই পরম বিশ্বাসের কণ্ঠে, গভীর স্বরে, চোখের পাতায় নির্ভরতা ও আনন্দের একটি মৃদুমধুর প্রলেপ ফুটিয়ে বলল, 'একজনের সন্ধানে আছি, যেদিন খুঁজে পাব সেদিন তোকেই প্রথম জানাব।'

শিল্পী তা টের পেয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আছে। শৈশব থেকেই অতীন্দ্রিয় যোগাযোগের মাধ্যমে একে-অন্যকে ভালোবেসে এসেছে, মাঝেমধ্যে ঘৃণাও, তবুও তাদের বন্ধুত্বের ফাটল ধরতে পারেনি, এই বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করে বলল, 'সত্যি।'

লাভলী তার মুখে কোনওরূপ উদ্বেগ প্রকাশ না করে, শান্ত সহজভাবে বলল, 'জানাবই তো।' সংক্ষিপ্ত জবাবের পর তার মুখে আর কোনও কথা ফুটল না, নিজের হৃদয়ের অন্ধকারে বাস করা ছবিটা বাইরের আলোতে প্রকাশ করতে সাহস পেল না, তৎক্ষণাৎ গায়ের উড়োনাটি কাঁধে ফেলে শিল্পীর দৃষ্টির সামনে নিঃশব্দে তার ঘর ত্যাগ করে নিজের বিছানা নিল।

সকালে বিছানা থেকে উঠতে লাভলীর মন চাইল না। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন শাদা ভোর, মেঘেভরা তরলান্তরণে ছেয়ে আছে আকাশ। জানালা দিয়ে দৃষ্টি বাইরে নিক্ষেপ করতেই চোখে পড়ল কুয়াশা ছিঁড়ে, দূরে একটি লাইটপোস্টের বাতির দিকে, যা এখনও জ্বলে আছে; তার চোখ অনেকক্ষণ সেই কমলা-রঙের বাতিতে গেঁথে রইল। সারা জগৎটি কেমন যেন শব্দহীন। নৈঃশব্দ্যের পাতলা আঁধরে ছমছম করছে। ভোরের শিশির হয়ত-বা মাটি পাচ্ছে ওউক-পাতা ছুঁয়ে। বুকের শব্দই শুধু নিজের কানে ধরা দেয়– এই যা। সারাঘর জুড়ে শুধু তার প্রশ্বাসের মৃদুতান। নিঃসাড় আঙিনায়, আলো-আঁধারের আয়নায় নিজস্ব প্রতিবিম্ব দেখে, নিজেকে মিলেয়ে নিতে চায় লাভলী। দূর থেকে চোখ ফিরিয়ে আনতেই তার দৃষ্টি আবদ্ধ হল জানালার পাশে, দুটো রবিন জীবনের স্বাদগ্রহণে ব্যস্ত। সে মনে মনে হাসল, পরক্ষণেই তার মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ওদের কিচিমিচি শব্দে। অনুভূতি জট পাকিয়ে দেয় হাজারও মুহূর্তের ছবি সব এক করে। বিছানা এখন ছাড়তেই হয়। সে আশঙ্কা করছিল নিচতলা থেকে মায়ের ডাক অসহিষ্ণু বিরক্তিভরা স্বরে প্রকাশ পাবে; হয়ত-বা মা নয়, বাবারই একটি দীর্ণ কণ্ঠের অবুঝ আওয়াজ সকাল বেলার সকল শান্তি, নিস্তব্ধতা নষ্ট করে দেবে; কিন্তু কিছুই ঘটল না। সে বিছানায় শুয়ে একটি চোখ ও একটি কান রুবেলের উদ্দেশে নিযুক্ত করে রেখেছে; রুবেলের উপর তার স্নেহ বা আবেগ যাই বলা হোক না কেন একটু বেশিই; ক'দিন ধরে তাদের মধ্যে মান-অভিমান চললেও; এ এক গতিময় সচল অনুভূতি; বড় প্রখর, বড় তীক্ষ্ণ, কখনও-বা শান্ত, কখনও-বা প্রশান্ত, বুদ্ধি ও মেধার ঔজ্জ্বল্যে কখনও-বা দীপ্ত। রুবেলের মুখশ্রীতে, তার নিষ্পাপ চোখে কীসের যেন এক রঙিন ছায়া সবসময় বাস করে; সেই মুখটির কথা ভাবলেই লাভলীর বুকে জমে ওঠে পরম অনুভব, অদ্ভুত

আনন্দের শিহরণ, আবার কখনও-বা মাথায়, কখনও-বা সারা শরীরে তুফান ওঠে পরম ভালোবাসার মৃদুস্পর্শ, রাঙা হয়ে ওঠে তার কোমলতম ঠোঁট, সব মিলিয়ে এক অনন্য পুরুষের মোহে লাভলীর গভীর অন্তরে যেন প্রাণবন্ত সুখ নেচে ওঠে।

লাভলীর ঘরের দেয়ালের অন্যপাশে ছোট একটি খাটে রাতের কাপড়চোপড় জড়িয়ে শুয়ে থাকা রুবেলও একটি প্রলয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু না কোনওকিছু দেখা দিল না। বিছানা থেকে উঠে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ঝাপসা আলো-অন্ধকারে আচ্ছন্ন বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরও একটি পাখিও চোখে পড়ল না, কিন্তু দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল কিচকিচ পাখির শব্দ। জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাথরুমের উদ্দেশে পা বাড়াল। বাথরুমে ঢুকে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে লাভলীর সঙ্গে তার মান-অভিমানের কথাই ভাবতে লাগল। মুখ ধুয়ে ফেলে বাথরুম ছেড়ে তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে স্থির করে নেয়, লাভলীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া উচিত। ঘরে ফিরে লাভলীর কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা ভঙ্গিতে ধীরেসুস্থে জামা-প্যান্ট বদলিয়ে, মাথায় চিরুনি চালিয়ে, হাতে ঘড়িটি বেঁধে বিছানার ওপর আবার উদাস হয়ে শুয়ে পড়ল, চোখে ঘুম এল না, দেহটা এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে ছটফট করছে, পেট খিদের জ্বালায় চোচো করছে, কিন্তু উপায় নেই, লাভলীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। টুকটুক করে দরজায় নক হল, এ-শব্দ রুবেল বেশ পরিচিত, তবুও উঠল না, অপেক্ষা করতে লাগল আরেকটি শব্দের জন্য, কোনও কোনও সময় রুবেল অকারণেই বেশ অদ্ভুত কাজ করে। অপেক্ষাকৃত আরও কয়কটি জোরে নক হল। এবার সে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে দিল। লাইট জ্বালাতেই খুব সহজ ভঙ্গিতে লাভলী ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। মুখকে হাসি হাসি ভাব। টেবিলের ওপর টোস্ট ও চা নামিয়ে রেখে লাভলী বলল, 'খেয়ে নাও। চা জুড়িয়ে যাবে।' রুবেল চোখ তুলে তাকাল লাভলীর দিকে, কিন্তু কিছুই বলল না। অভিমানে মুখটি যেন কেমন গম্ভীর হয়ে আছে। লাভলী আবারও বলল, 'খেয়ে নাও। চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

কথা শেষ করেই লাভলী ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াল, রুবেল ডাকল, 'শোন, খাবারগুলি নিয়ে যাও। আমি খাব না।'

রুবেলের কথা ও ভঙ্গি লাভলীকে থামিয়ে দিল। রুবেল যে কী চায় তা তার কাছে অজানা নয়, কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া প্রয়োজন, কারণ এরইমধ্যে, একে-অপরের মাঝে, এক নতুন ধরনের আত্মীয়তা তৈরি হয়ে গেছে, তাই লাভলী অভিনব নম্রতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এল। গম্ভীরমুখে, চোখে চোখ রেখে, প্রশ্নভরা শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'কেন খাবে না!'

রুবেল নিশ্চুপ। লাভলীর মত স্বস্তির ও কৃতজ্ঞতাবোধ তার মধ্যে অস্পষ্ট, বরং সে অস্থির ও দুর্বোধ্য, অন্তরে ঠিকই গোপন আগুন জ্বলতে থাকে, তাই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রুবেল। লাভলী কৈফিয়তের স্বরে আবারও বলল, 'রাগ করেছ?'

রুবেলের গলায় অস্ফুট শব্দ হল, 'করলেই বা কী?'

'করলে তো আমাদের নিন্দা হবে?'

'নিন্দা...।'

'হ্যাঁ, নিন্দা। দেশের আপনজনের কাছে নিন্দা করবে, বলবে, বিলাতে এমন বাড়িতে ছিলে যে, সময় মত খেতে দেয়নি। তখন কী হবে? এরকম অপযশের চেয়ে একটু খেটে তোমাকে খাওয়ালেই ভালো।'

বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায়ই রুবেল বলল, 'তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।'

‘মনে হচ্ছে তোমার খুব উত্তেজিত অবস্থা। রাগ করে লাভ নেই! আব্বা আমাকে তোমার সেবাযত্ন করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই তুমি আমার ওপর যতই রাগ কর না কেন, আমি কিন্তু আমার কর্তব্য ঠিকই পালন করব।’

লাভলীর কথায় অপূর্ব গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে রুবেল একটু সময়ের জন্য থমকে গেল, পরক্ষণে বলল, ‘কর্তব্য?’

‘হ্যাঁ, কর্তব্য। দুজন একই বাড়িতে বাস করলে কর্তব্য তো পালন করতেই হয় তাই না।’

রুবেল তার স্পষ্ট দৃষ্টিতে লাভলীর মুখটিকে দেখে নিল। বাস্তবিকই লাভলী সুন্দরী, বেশ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে তাকে। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে রুবেল বলল, ‘মিষ্টি করে কথা বলতে আমি পছন্দ করি না, তাই বলছি, তোমার বাড়ি মানে তোমাদের বাড়িতে আমি বেশি দিন থাকতে পারব না। অতএব আর বেশি দিনের জন্য তোমাকে কর্তব্য পালন নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি একটি থাকার জায়গা খুঁজে পেলেই চলে যাব।’

‘তুমি যে কঠিন কথা বলতে পার তা আমার অজানা নয়। তবে একটা কথা বলি শোন, পুরুষমানুষের এত রাগ থাকা উচিত না।’

রুবেল নিঃশব্দে হেসে ফেলল, তারপর বলল, ‘পুরুষমানুষের রাগ থাকবে না তো থাকবেটা কী শুনি!’

‘পুরুষমানুষের রাগ ছাড়াও অন্যকিছু থাকা চাই।’

লাভলীর কথা শুনে রুবেলের একটু খটকা লাগল, মেয়েটি বলে কী! একবার ভাবল, পরিণত নারীর সান্নিধ্য পাওয়ার সাধ এখনই কী মিটিয়ে নেবে! অস্বাভাবিকরকম একটি রহস্য যেন লেগে আছে লাভলীর দেহে। এ-দেহে, এ-মাথায় অতি সন্তপর্ণে আস্তেধীরে একটু হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বুকের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে মমতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কী-ই-বা শারীরিক প্রক্রিয়া থাকতে পারে, কিন্তু পরক্ষণে যখন বুঝতে পারল বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে একরকম আকাশপাতাল পার্থক্য আছে, আছে অপমানের জ্বালা, যার প্রতিকার করার কোনও পথ তার থাকবে না, প্রতিকারহীন অপমানে শুধু থাকে প্রতিশোধের বাসনা, তখন রুবেল নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘আমাকে কিচ্ছুই করতে হবে না।’

লাভলী একটু বিস্ময়ের সঙ্গে রুবেলের মুখের ভাবটি দেখতে লাগল। তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে, যেন এরমধ্যে একটি অসহজের জটিলতা বাস করছে, বলল, ‘মাঝে মাঝে তোমার পাগলামি দেখে নিজের গলায় দড়ি ঝোলাতে মন চায়।’ কথাগুলো বলেই লাভলী উধাও হয়ে গেল। রুবেল রাগের মাথায়ও চায়ের কাপ বা নাস্তার প্লেটটি ছুঁড়ে মারতে পারল না, বরং মুখ বুঁজে বুকের জ্বালা সহ্য করছে, আর ভাবছে কীসে এর প্রতিকার! এই অজানা অন্ত রজ্বালাই প্রতিশোধের কামনাবাসনাকে বাড়িয়ে দেয়। লাভলীর চলে যাওয়ার ভঙ্গি ছিল অদ্ভুত, সে-দেহভঙ্গি রুবেলকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে সাহায্য করল, সে নিজের বাহুবন্ধনে লাভলীকে আবদ্ধ করতে চায়, চায় তার কাঁচা রক্তমাংসে শাস্তি দিতে, চায় তাকে অসুরের মত নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে অকথ্য যন্ত্রণা দিতে, বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শরীরে আঁচড় কাটতে; কিন্তু কিছুই করতে পারল না সে। পিতলের মূর্তির মত নির্বাক বসে, মুখে খাবার তুলে দেওয়া ছাড়া তার আর কোনও উপায় নেই।

সকাল থেকেই বদরুদ্দিন ও তাজিদউল্লা উভয়ে মিলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাম্পানক্রস অঞ্চলের বাঙালি মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সাড়াও পাওয়া গেল অনেক। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন[৯] ও মুসলিম সোসাইটি[১০] থেকে সহযোগিতার আশ্বাস এল। এদের মধ্যে যে রেষারেষি বিরাজ করছে তাও কমবেশি স্পষ্ট আকারেই

[9] North Islington Welfare Association.
[10] Islington Muslim Society.

ভেসে উঠল, এ রেষারেষির মূল কারণ, উভয় সংস্থাই এক এলাকায় অভিন্ন কাজ করে সরকারিগ্রান্ট কত বাগাতে পারে এ-নিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা, তাই ঘেঁষাঘেঁষিতে যা হয়– ঘটে সংঘর্ষ। একথারই সত্যতা কিছুটা উদ্ঘাটিত হল বদরুদ্দিন ও তাজিদউল্লার সামনে।

বিকেলে, বদরুদ্দিন ও তাজিদউল্লা মুসলিম সোসাইটির আমন্ত্রণে এই সংস্থার অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। সভাপতি ও স্থানীয় ব্যবসায়ী মনোহর খান উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন, 'আমার সমর্থনকারী শমসের আলীর প্রাপ্যপরিশোধ ব্যাপারে তাজিদউল্লার বিরুদ্ধে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত আপনারা গ্রহণ না করলে সর্বদলীয় একতার আলাপ বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাবে।' বদরুদ্দিন বুঝতে পারলেন না কী বলবেন, অপারক হয়ে শুধু বললেন, 'আমরা নতুন সংগঠন তৈরি করতে যাচ্ছি। আমাদের বলতে গেলে এখনও জন্ম হয়নি, তাই এখন আপনাদের সংগঠনের বিচারবৈঠকে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়, অযথা কালক্ষেপন।' কথাটি শোনে ক্ষেপে গেলেন মনোহর খান। রাগ মানুষকে মাতালের চেয়েও নীচে– পাতালে পৌঁছে দেয়; সুরাপায়ীর কথা যেমন জড়িয়ে যায়, কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় না, তেমনি অনায়াসে রাগীর কথাও বেরিয়ে আসতে চায় না মুখ দিয়ে– চিন্তার আগে উচ্ছৃঙ্খলতার চিৎকার যেন, গর্দভস্বর প্রকাশ মাত্র, যা বিদঘুটে শোনায়। রাগীর বিকৃত চেহারা স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারলে বোধ হয় সে ক্রোধের কদর্যকবজা থেকে অনেকাংশে নিজেকে নিষ্কৃতি দিতে পারত। সভার সভ্যতা বিনষ্ট করে, শুঁড়ি নিকৃষ্টতম বিশ্লেষণে তাজিদউল্লাকে ভূষিত করে, কারো অনুরোধ কর্ণপাত না করে, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন মনোহর খান সভাকক্ষ থেকে। পরক্ষণে তাজিদউল্লা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বদরুদ্দিনের সঙ্গে বেরিয়ে এল। রাস্তায় পথ ভাঙতে ভাঙতে তাজিদউল্লা ধূমপানজনিত কর্কশগলা পরিষ্কার করে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'মদ বিক্রি করে পয়সা করেছে ব্যাটা। কি ভেবেছে নিজেকে! হারাম টাকা। পয়সাওয়ালাকে সম্মান করা মানুষের ব্যারাম, আমার নয়। টাকার ব্যারামে ভোগতে ভোগতে তার মেজাজ এখন ছাপ্পান্ন। ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। হারামি না হলে কেউ কী কখনও হারাম ব্যবসা করতে পারে! বিপদে পড়লেও আমি এ-হারামির সাহায্য নেব না। ছয়ফরাজ হওয়ার সখ আমার নেই, বরং আল্লাহর কাজে আমি হালাল মানুষের পায়ের কাদা হতে রাজি আছি।'

আশ্বাস দিলেন বদরুদ্দিন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমাদের এমন নেকির কাজে ফাঁকিবাজ লোক থাকলে মাগনা আপনা কাজ বাগিয়ে নেবে।' তারপর বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'সে এক নম্বর বানিয়া– রাঘব বোয়াল।'

বদরুদ্দিনের সিগারেট জ্বালানোর ফাঁকে তাজিউল্লাহ হেঁকে উঠল, 'আমাদের তিরিক্ষি মেজাজওয়ালা মানুষের প্রয়োজন নেই। খোদাদাদ নেয়ামতই যথেষ্ট।' শাদা গোল টুপিটি কেশহীন মস্তক থেকে খুলে পুনরায় ইহুদি কায়দায় নিজের মাথায় দিয়ে ও উপরওলার দিকে তাকিয়ে হেসে যোগ করল, 'তির্যকযোনির স্থান আমাদের সভ্য সমাজে নেই।'

বদরুদ্দিন ভাবলেন, কারো অসাক্ষাতে এমন তির্যক তিরষ্কার-হীনকুৎসা যে অত্যন্ত কুৎসিত। যেকোনও লোকের মুখে এরকম কথা প্রকাশ করা অশোভন নয় কী? এ-ধরনের মন্তব্যে বক্তার হীনমন্যতার পরিচায়ই প্রকাশ পায়। অন্ততপক্ষে আমার মনে হয় এ-ধারণা পোষণ করা কারো উচিত না।

তারা বদরুদ্দিনের বাড়িতে পৌঁছতেই দেখতে পেলেন তিনজন মাতব্বর তার অপেক্ষায় বসে আছেন। প্রথম মাতব্বর বলেন, 'আরও একটু দেরি হলে আমরা চলে যেতাম।'

এরইমধ্যে এসে উপস্থিত হলেন আরও কয়েকজন সদস্য। চা-পান খাওয়া ও সংগঠন নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলাপালোচনার পর দ্বিতীয় মাতব্বর বললেন, 'আপনাদের প্রচেষ্টায় একে-অন্যের মধ্যে ও তাদের ভেতরকার উপদলীয় বাকবিতণ্ডা সাময়িকভাবে হলেও পরিহার করা সম্ভব। তাই বলি, আর দেরি না করে আমরা আমাদের সংগঠনের জন্য সাধারণ সভার আহ্বান করা উচিত।'

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ১৬ই নভেম্বর একটি সাধারণ সভার আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেদিন দস্তুরমাফিক ঘোষণা করা হবে নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম, তারপর সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পন করা হবে নির্বাচিত কমিটির ওপর; তবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সামনে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল সভাপতির প্রশ্নে।

প্রথম মাতব্বর বললেন, 'ইংরেজি শিক্ষিত দাড়িওয়ালা পরহেজগার একজন মানুষের প্রয়োজন। সততা ও আন্তরিকতা সফলতার চাবিকাঠি।'

দ্বিতীয় মাতব্বর বললেন, 'হাজি শামসুল হক আছেন।'

তৃতীয় মাতব্বর বললেন, 'প্রাক্তন সভাপতি সৈয়দ বেলাল আহমেদও আছেন।'

প্রথম মাতব্বর বললেন, 'অবশ্য সৈয়দ বেলাল আহমেদ গতবছর হজ্ব পালন করেছেন।'

বদরুদ্দিন ভাবলেন, হজ্বব্রতপালন করা অনেক ব্যক্তি সংসারের প্রতি আরও বেশি আসক্ত হয়ে পড়েন। ইসলামে বৈরাগ্য নেই বলেই কি এরকম হয়, কে জানে! আর প্রকাশ্যে বললেন, 'যে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে তার প্রতি কী কোনওরকম আশ্বাস রাখা যায়!' চুপ হয়ে গেলেন তিনজন মাতব্বর, অচেতনেই হয়ত। সাম্পানক্রসের পাশে অবস্থানরত একটি বাড়িতে কয়েকজন লোক একসঙ্গে চুপ হয়ে গেলে এই ব্যস্ত জায়গাটির স্বাভাবিক ব্যস্ততা হারিয়ে ফেলে; অস্বাভাবিকই, এরকম স্তব্ধতার মধ্যে শুধু শোনা যায় প্রতিটি মানুষের সমবেত শ্বাসপতন ও শ্বাসগ্রহণ। বদরুদ্দিন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যোগ করলেন, 'আসল সমস্যা হচ্ছে– উভয় ব্যক্তিই মসজিদের নামে অনেক চাঁদা আদায় করেছিলেন সাম্পানক্রুস এলাকা থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মসজিদ দিতে পারেননি। মাঝ থেকে টাকাগুলো উধাও। তাই সাম্পানক্রুসের বাঙালি মুসলমানরা তাদের প্রতি নারাজ।'

মাসুদ মিয়া বললেন, 'বিশ্বাস একবার হারালে আবার ফিরিয়ে আনা দুষ্কর।'

একটু ভেবেচিন্তে তাজিদউল্লা বলল, 'আছেন একজন, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। রাজি হবেন কী না, তা বলতে পারব না।'

কথাটি লুফে নিলেন মাতব্বর তিনজন, একইসঙ্গে তারা জানতে চাইলেন যে, নামঠিকানা, বংশপরিচয়। 'বংশ' শব্দটি মাসুদ মিয়ার কানে বাঁধল, তিনি ভাবতে লাগলেন, কেন আমাদের দেশে বংশপরিচয় এত প্রাধান্য পায়। যদিও এদেশে ব্যক্তিপরিচয়ই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়, তবুও এসব দেখে কী বাঙালি সমাজে কোনও পরিবর্তন আসছে না। একসময় অনুকূল পরিবেশে বড়োলোক হিশেবে গড়ে উঠেছিল বলে সে-বংশের সবই তো আর ভালো মানুষ হয় না, কিন্তু এ-যেন স্বতঃসিদ্ধ কথা, খুবই স্বাভাবিক। পরিবর্তিত পরিবেশে ব্যতিক্রম দেখা দিলে বলা হয়, সুমিষ্ট মালদহী আম পচে গেলে গোবর হয়ই– অখাদ্য।

ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করতেই তাজিদউল্লার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আখলাক মিয়া বলল, 'আমি ছোটবেলা থেকেই তাকে চিনি। সদ্ববংশজাত, জ্ঞানী মানুষ, তবে একেবারেই পরহেজগার নন। ধর্মের প্রতি তিনি উদাসীন। অতিরিক্ত অধ্যয়ন ও বেশি বেশি পুঁথিপুস্তক পাঠে বোধ হয় তাকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।' বাঁ-হাত দিয়ে আখলাক মিয়া টেবিলে এমন ঠেলা দিল, টেবিলের ওপর রাখা চায়ের কাপটি পর্যন্ত কাৎ হয়ে আবার নিজ জায়গায় সোজা হয়ে বসল। কৌতুক-হাসিতে মাসুদ মিয়ার আঁখিতারা নেচে উঠল, ভাবলেন, এরকম আজব কথা শোনে কে-না তাজ্জব হবে না! বেশি করে পড়া কী একটি দোষে পরিগণিত হয়? আর সহাস্যে প্রকাশ্যে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি যে বেশি বই পড়েন এমন কথা আপনি জানেন কী করে?'

'তার বুকশেলফে কোরআন, গীতা, বাইবেল, রবীন্দ্র, নজরুল আরও কত কিছুর বোঝাই নিজ চোখে দেখেছি, সেগুলো পড়তেও দেখেছি।'

মাসুদ মিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বদরুদ্দিন ফিসফিস করে বললেন, 'বই পড়লে জ্ঞান বাড়ে– একথা বুঝে না কোন ষাঁড়!'

'বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে যে-মানুষের যত বেশি জ্ঞান থাকে,' মাসুদ মিয়া বললেন, 'শুধু তিনিই স্বধর্মের পক্ষে উপযুক্ত যুক্তি প্রকাশ করতে পারেন।'

'কথাটি ঠিকই বলেছেন।' দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন হাজি শামসুল হক, 'তবে ধার্মিক হতে হবে।'

বদরুদ্দিন মন্তব্য করলেন, 'মসজিদ নামের পরশপাথরের সংস্পর্শে যদি কেউ একবার আসেন তবে তাকে ধার্মিক না হয়ে উপায় কী আছে।'

হাজি শামসুল হকের কণ্ঠ দিয়ে দুটো কথা বেরিয়ে এল, 'আমাদের মসজিদের আমীর বলেন যে, কোরআন-হাদিসের বাইরে কোনওপ্রকার জ্ঞান অর্জন করা অনাবশ্যক।'

সঙ্গে সঙ্গে মাসুদ মিয়া তার মগজকে ভাবনার জগতে পাঠিয়ে দিলেন, যদি তাই হত তবে হযরত কেন জ্ঞানান্বেষণের জন্য চীনে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীনসমাজে কোরআন-হাদিসের নামনিশানাই ছিল না। হাজি শামসুল হকের প্রপাগাণ্ডা থেকে যে ধরনের বাকবিতণ্ডার জন্ম হয় তার ঊর্ধ্বে ওঠে শরতের নীলাকাশে বিচরণ করতে হবে, যাতে গ্রীষ্মের ধূলোমলিন আবহাওয়া নাগাল পায় না। আর প্রকাশ্যে বললেন, 'আপনারা গিয়ে তার সঙ্গে আগে আলাপ করুন। তারপর দেখা যাবে। এখন অযথা প্রলাপ বকে লাভ কী?' মাসুদ মিয়া কথাগুলো এত নিম্নস্বরে বললেন যে, দক্ষিণ দেওয়াল ঘেঁষে বসা ব্যক্তিটির কর্ণগোচর হল না, কিন্তু বদরুদ্দিন বিনা দ্বিধায়ই কথাটি সমর্থন করলেন, 'আগামীকাল রোববার। চলুন আমরা কজন মিলে কাজীসাবের বাসায় যাই। আর 'না' বললে হবে না।' তাজিদউল্লা ও আখলাক মিয়ার দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'আপনাদের দুজনকে যেতেই হবে, পরিচিত লোক সঙ্গে থাকলে শুরুটা সহজ হয়।'

বদরুদ্দিনের আড্ডায় আসা অতিথিদের জন্য লাভলী চা-নাস্তা, পান-সুপারি তৈরি করার কাজকর্মের ব্যস্তময় সময়টাতেও রুবেলের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। সকালে তার সঙ্গে আলাপের পর এখন পর্যন্ত কোনও বাক্য বিনিময় হয়নি। রুবেল কলেজ থেকে ফিরে গম্ভীর বিষণ্ন মুখে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সন্ধ্যার কাজে চলে গেল, যথা সময়ে ফিরেও এল, কিন্তু কোনওরকম ছুতো ধরে তার সঙ্গে কথা বলতে আসেনি। লাভলী মনে মনে বলল, 'দুপুরে তার ঘরটি আমিই তো পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম, সেজন্য একটি ধন্যবাদ, ছোট একটি থ্যাঙ্কস জানাতে সে তো আসতে পারত।' বসারঘরের আড্ডার শব্দগুলি থেমে থেমে উত্থিত হতে হতে প্রায় নীরব এখন, হয়ত-বা অতিথিরা নিঃশব্দ পদক্ষেপে আড্ডা ছাড়ছেন। দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে খোলা করিডোরটি একবার দেখে নিল লাভলী। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সমস্ত সঙ্কোচ মন থেকে ঝেরে ফেলে, এক কাপ চা হাতে করে, নিঃশব্দে রুবেলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একটু সময় নীরব থেকে বলল, 'চা চলবে।'

রুবেল বলল, 'দাও।' সে যেন এর জন্যই প্রতীক্ষায় ছিল।

দরজা খোলে যেতেই লাভলী ঘরে ঢুকল। বিছানার পাশে একটি ছোট টেবিলে চায়ের কাপটি রাখতে রাখতে একবার দেখে নিল রুবেলকে। সে নির্বাক। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে লাভলীই মুখ খুলল, 'আচ্ছা, বলত, আব্বা আম্মা কী ভাবছেন?'

রুবেল নিশ্চুপ। লাভলী বলল, 'তুমি যে কীরকম কাণ্ড করছ তা কী সঠিকভাবে বুঝতে পারছ?'

রুবেল কোনও উত্তর দিল না। লাভলী বলল, 'আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না যে!'

‘কী দেব! আমি তো কোনও কাণ্ড ঘটাইনি। আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার জন্য কথা না-বলে এ-বাড়িতে নির্লজ্জভাবে বসবাস করার চেষ্টা করছি।’

লাভলী অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বলল, ‘তোমার কথা না-বলাটাই হচ্ছে আমার যন্ত্রণার কারণ।’

‘যন্ত্রণা কেন হবে? বরং তোমার প্রাণ শান্তির প্রলেপে ভরে ওঠার কথা।’

‘শান্তি! হাসালে! দশজনের কানাকানি, কৌতুক-ঠাট্টা তো আর তোমার চামড়ায় লাগে না। লাগে আমার।’

‘দোষটা কী আমার?’

‘না, দোষটা আমারই! আমার সম্বন্ধে তোমার ...।’ লাভলী আর কিছু বলতে পারল না। এঁটেল মাঠির কাদায় পা যেমন রুখে দাঁড়ায় তেমনি লাভলীর কথাগুলো জিভের মূলে এসে থেমে গেল। সে যে-কথাটি প্রকাশ করতে চেয়েছিল তা ভাবতে গিয়ে তার চুল পর্যন্ত রোমাঞ্চজনক শিহরণ দিয়ে উঠল, তাই বাক্যটি শেষ করার জন্য বলল, ‘আশ্চর্য!’

‘আশ্চর্য... মানে, বুঝলাম না।’

লাভলী লাঞ্ছিত সুরে বলল, ‘তুমি বুঝলে কী আমার এরকম দশা হয়! তোমার ব্যবহারে গত কয়েকদিন ধরে আমি কীরকম অস্থির-অতিষ্ঠ-উত্ত্যক্ত হয়ে আছি। কষ্ট পাচ্ছি। তুমি কী বুঝ?’ রুবেল কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লাভলী তাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে যোগ করল, ‘তুমি কী এসব চোখে দেখতে পার না? অকারণে তিলকে তাল করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?’

রুবেল উত্তর দিল না। মৌন পৃথিবীটা যেন তার মুখের উপর চেপে বসেছে। রুবেলের মুখটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করে লাভলী বলল, ‘আমি এখান থেকে চলে গেলেই বুঝি তুমি খুশি হোও।’ রুবেল নিরুত্তর। লাভলী যোগ করল, ‘হ্যাঁ, না কিছু একটা বলো।’

লাভলীর নিষ্ঠুর আঘাতেও রুবেলের নীরবতা ভাঙল না, অন্ধকারকেও ডিঙ্গিয়ে গেল। রুবেলের স্পর্ধা দেখে ক্রোধে লাভলী ঘর ত্যাগ করতে ঘুরে দাঁড়াতেই, রুবেল উড়োনার একপ্রান্ত ধরে ফেলল। ঠিক তখনই শিল্পী রান্নাঘর থেকে ছুটি পেয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। শিল্পীর সিঁড়ি ভাঙার আওয়াজ ও বসারঘর থেকে বদরুদ্দিনের কণ্ঠে ‘হ্যালো’, ‘হ্যালো’ বলা শব্দগুলি লাভলীর কানে পৌঁছতেই, একবার অপাঙ্গে রুবেলকে দেখে, একটানে নিজের উড়োনার আঁচলটি মুক্ত করে দ্রুতপায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। লাভলী করিডোরে দাঁড়িয়ে একবার শুনে নিল বদরুদ্দিন কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন। নিজের ঘরে যেতে যেতে লাভলী শুনতে পেল বদরুদ্দিন বলছেন, ‘এটা কী কাজীসাবের বাড়ি?’

‘জ্বি। আমি হাসু বলছি। বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?’

কাজীর এখন প্রধান হবিই হচ্ছে বই পড়া, ইতিমধ্যে নাতিনের কাছে হয়েছেন কবি, এরকম একটি কবিতা লেখার সময় ফোনটি বেজে উঠেছিল, কিন্তু তিনি ফোনটি ধরেননি, ফোন ধরেছে হাসু।

‘আমি কী একটু কাজীসাবের সঙ্গে কথা বলতে পারি? উনি কি আছেন?’

‘জ্বি, আছেন।’

‘দেওয়া যাবে?’

‘একটু হোল্ড করুন। আব্বু স্টাডিরুমে, ডেকে দিচ্ছি।’

‘হোল্ড করছি। ব্যস্ত থাকলে না হয় পরে ফোন করব।’

‘ধরুন, দেখছি।’

ফোনের মাউথপিস ফোন-টেবিলের উপর রেখে হাসু স্টাডিরুমের দরজা খুলে একটু উঁচু গলায় বলল, 'আব্বু তোমার ফোন।'

'কে ফোন করেছেন?'

'একজন ভদ্রলোক। নামটা জানা হয়নি।'

'ঠিক আছে। আমি দেখছি।'

কাজী ফোনের কাছে এগিয়ে যেতেই কাজীগৃহিণী টিভি-র শব্দ অবশ্যম্ভাবী কমিয়ে দিলেন। দুটো শব্দ একসঙ্গে হলে তিনি কোনওটাতেই মনোযোগ দিতে পারেন না, অভ্যাসের অভাব। কাজী পারেন, খানিকটা তাদের ছেলেমেয়েও পারে।

'জ্বি, আমি কাজী বলছি। আপনি কে বলছেন?'

কাজীগৃহিণী কাজীর কণ্ঠ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। সবকিছুই নীরব।

আবার কাজীর কণ্ঠ ভেসে এল, 'ঠিক আছে। আসুন, রোববার বিকেলে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।'

নীরব।

'ও আচ্ছা। আমি আপনাদের জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হব।'

নীরব।

'চেষ্টা করব বই-কি!'

নীরব।

'তবে কোনও ঝামেলায় জড়াতে চাই না। নির্ঝঞ্ঝাটে নিশ্বাস ফেলতে চাই।'

নীরব।

'আসুন।'

নীরব।

'কোনও আপত্তি নেই। দেশের মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুশিই হই।'

ফোনটা রাখতেই কাজীগৃহিণী ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'হঠাৎ করে ওদের কাল নিমন্ত্রণ করার কী কোনও দরকার ছিল?'

'কী করব, 'না' করতে পারলাম না যে।'

কাজীগৃহিণী ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তোমার তো মনে আছে আমরা কাল বেড়াতে যাচ্ছি।'

কাজী বেকুবের মত তার স্ত্রীর মুখপানে তাকিয়ে রইলেন। তার পুরনো অভ্যাসের ভুল খুব স্পষ্টভাবেই ধরা দিল তার সামনে। কাজী আবুল ফজলের মনের ওপর দিয়ে গত ক-বছর ধরে যে ঘন ঘন ঘূর্ণিব্যথার আক্রমণ চলছে, তার অন্তর ঝরাপাতার মত ছিন্নবিচ্ছিন্ন; প্রথমত, আপনজনের স্বার্থপ্রবণতায় ও আন্তরিকতাহীনতায় সারা জীবনের বৃহত্তর পরিবার পরিকল্পনা– ভাইবোন সকলকে সুখি করার প্রচেষ্টাসৌধ– তাসের ঘরের মত ধূলিসাৎ হয়ে গেল, চরম ত্যাগ স্বীকার করেও ধরে রাখতে পারলেন না তিনি; দ্বিতীয়ত, ধূম্রজাল আচ্ছন্ন বাংলার আকাশে জাতির পিতা রূপে শেখ মুজিবের আবির্ভাব মনে হয়েছিল জাতির দিকদিশারী ধ্রুবতারার মত দীর্ঘস্থায়ী হবে, কিন্তু হায়! যখন ধরা পড়ল এ শুধু উল্কো– স্বল্পস্থায়ী, অল্পদিনের জন্য বঙ্গবন্ধুরূপী ভেলকিবাজি তখন কাজীর অন্তর তীব্রভাবে আঘাত

পেল। পেটিবুর্জোয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হল, জনসাধাণের প্রতি নিমকহারামীর নগ্নরূপ প্রকাশিত হল, তারা সক্ষম হল নেতাকে বিভ্রান্ত করতে। তোষামোদকারী পরিবেষ্টিত আত্মীয়-বন্ধু-পরিষদের সাহায্যে মোগল বাদশাহীস্টাইলে শতাব্দী শোষিত কিন্তু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কোনও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা যায় না সুগভীর স্বদেশপ্রেম সত্ত্বেও, তাই শুরু হল অব্যবস্থা। এ-সত্ত্বেও সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ও জেলে বন্ধী চার নেতার নিষ্ঠুর হত্যার দুঃসংবাদে বিদীর্ণ অন্তর আলোড়িত করে ঘন ঘন ঘটে গেল জাতীয়-জীবন-আঁধার-করা ঘটনাবলী, প্রধান ষড়যন্ত্রকারী অপসারণের প্রয়োজনে ক্যু, কিন্তু পরক্ষণে পাল্টা ক্যু দ্বারা পটপরিবর্তনের নৃশংসতার প্রেতাত্মা আবির্ভূত হল শাসন মঞ্চে। কৃষ্ণচশমা আবরণে কৃশাণবিষাণের মনে আশা সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে– জীবননদ সন্তরণে সাহায্যের অলীক আশাদানে পারদর্শী পার্থসারথি যেন। সোনার বাংলার বদলে বাংলার শোষিত মানুষ স্বাদ পেল নবতম শোষণপদ্ধতি।[১১] দুর্বার বেগে জাতির এ অধঃপতনে, কারবালা নিধনে, শঙ্কিত দেশপ্রেমিক দশজন প্রবাসী বাঙালির মত দুশ্চিন্তানলে দগ্ধিভূত হলেন কাজী আবুল ফজল। এসব ব্যথার অনেকটা নির্বাপিত হয়েছে, কিছুদিন আগে ছেলেমেয়ের শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ্য করে, তাই এখন কোনও কিছুতে সহজে জড়াতে চান না, মনের বর্তমান প্রশান্তির ব্যতিক্রম ঘটাতে তিনি অনিচ্ছুক।

[১১] 'অসমাপ্ত বিপ্লব' বইয়ের প্রণেতাদ্বয়ের মতে।